ডক্টর ইউনুসের নোবেল পুরস্কারলাভ ও বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন

আশরাফ আলী ও শায়লা আলী

(১) অবতারণা - ডক্টর ইউনুস বাংলাদেশের রাস্ট্র-দায়িত্ব গ্রহণ করুন

ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক ২০০৬ সনের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়াতে বাংলাদেশী মানুষ আজ বিশেষভাবে গর্বিত। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের জন্য এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে খুবই সম্মানজনক। আমরা এই সম্মান ও গর্ববোধের সাথে নির্দ্বিধায় একাত্বতা ঘোষণা করছি। তবে আমরা কেবল গর্ববোধ করেই থেমে থাকতে চাই না। বরং আমরা ভেবে দেখতে চাই, এই পুরস্কারপ্রাপ্তি এমন কোন শুভ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিনা যা বাংলাদেশের জন্য স্থায়ী ও অনপনেয় মঙ্গল বয়ে আনতে পারে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক দশক কেটে গিয়েছে। এরপর প্রায় দশক দুই হয়ে গেলো জনগণের নির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করছে। জনগণ নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের আশা নিয়ে সরকার নির্বাচন করে। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের শাসন দিয়ে এ-পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। দেশে আবার নতুন নির্বাচনের সময় এসেছে। যে-রাজনৈতিক দলই (বি-এন-পি, আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টি) ক্ষমতায় আসুক না কেন এর ফলাফল থেকে বাংলাদেশের মানুষ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চিনদেশ, কোরিয়া, হংকং অথবা তাইওয়ানের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশা করতে পারে না।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও মূলতঃ তিনটি ‘রেন্ট’ অনুসন্ধানকারী কমিশনভোগী শ্রেণী দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। শ্রেণীগুলি হচ্ছে :

(১) ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলীয় প্রধানগণ ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং নিকট রাজনৈতিক অনুসারী,

(২) সামরিক ও বেসামরিক আমলা ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং

(৩) ব্যবসায়ী/আমদানীকারক ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন।

নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদল হলে **১** নম্বর শ্রেণীর স্বত্বভোগ বিরোধী রাজনৈতিক দলীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং নিকট রাজনৈতিক অনুসারীদের হাতে গিয়ে পড়ে। দেশের দরিদ্র মানুষ দরিদ্রই থেকে যায় এবং তাদের ভাগ্য অপরিবর্তিতই থেকে যায়। এই তিনটি শ্রেণীর কমিশনভোগের মুখে গোটা জাতির অগ্রগতি কারারুদ্ধ হয়ে আছে।

বোঝা যায়, কেবল নির্বাচনী হাতবদল দিয়ে বাংলাদেশের যথার্থ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে না। সে-কারণে ডক্টর ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল আশীর্বাদস্বরূপ। ডক্টর ইউনুস এখন একজন জাতীয় ব্যক্তিত্বই শুধু নন, বরং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বও বটেন। এই সুযোগে দেশবাসীকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পুরো দায়িত্বভার ডক্টর ইউনুসের হাতে ছেড়ে দেবার কথা গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিৎ। কেবল লোক-দেখানো আনুষ্ঠানিকতা নয়, এখানে সত্যিকার ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে ডক্টর ইউনুস সারা দেশের সমর্থন পাবেন বলে আশা করা যায়।

(২) গ্রামীণ ব্যাংক তথা এনজিও নীতিমালা ও কার্যক্রমে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে না

ডক্টর ইউনুস বাংলাদেশের রাস্ট্র-দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলে তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকের নীতিমালাকে পিছনে ফেলে আসতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং যেসব নীতিমালা বাস্তবায়িত করতে হবে সেগুলি গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত কার্যক্রম ও নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ও নীতিমালা দিয়ে দেশগড়া সম্ভব নয়, বরং সেগুলি অনেকক্ষেত্রে দেশোন্নয়নের পরিপন্থী হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও বিদেশী অর্থে ও নির্দেশনায় বাংলাদেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে তারা কখনও স্বদেশে ক্যাপিটাল ও ডুরেবোল গুড্স্ নির্মাণের শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে কাজ করতে পারে না। আমরা নীচে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো।

বলে রাখা দরকার, এই ধরণের শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশী মানুষের গড় উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট মাত্রায় বাড়ানো সম্ভব এবং এই ধরণের শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করাটাই বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি। বিশেষতঃ বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান দেশ বিধায় স্বদেশে ক্যাপিটাল, ডুরেবোল ও অন্তর্বর্তী পণ্যদ্রব্য নির্মাণের শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব আরো বেশী। কারণ, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি ও ধারণ করে রাখার কাজে স্বদেশে ক্যাপিটাল, ডুরেবোল ও অন্তর্বর্তী পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করাটা অপরিহার্য।

উল্টোদিকে, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো এনজিওগুলি ডিম-দুধ-ঝুড়ি বিক্রি, বিচ্ছিন্নভাবে মাছের চাষ, বয়স্ক/নারী শিক্ষা, গার্হস্থ্য পর্যায়ে তাঁত-বুনন, ইত্যাদি 'দারিদ্র্য বিমোচন' বিষয়ক কাজে তাদের সর্বশক্তি ও প্রয়াস ব্যয় করছে। 'দারিদ্র্য বিমোচন' শীর্ষক ধারণাটি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে চলে আসা একটি পুরোনো মনোভাব। মূলধারার অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে এর কোনো স্থান নেই এবং এর মাধ্যমে দেশের উৎপাদনশীলতা বাঞ্ছিত মাত্রায় বাড়ানো সম্ভব নয়।

মূলধারার বাজারভিত্তিক অর্থনীতি 'প্রতিযোগিতা'র বলে চলে। সেখানে 'দারিদ্র্য বিমোচন'-এর মতো করুণা বা আত্মত্যাগ অথবা দয়া-দাক্ষিণ্য বা স্বেচ্ছাসেবিতার স্থান নেই। থাকলেও তার অস্তিত্ব কেবল প্রান্তিক পর্যায়ের। বাজারভিত্তিক 'প্রতিযোগিতা' নৈর্ব্যক্তিক ও স্বয়ংচালিত।

এনজিওগুলি শিল্পোন্নত দেশ থেকে উদ্গত তথাকথিত নানা প্রকৃতির আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। একথা বুঝতে হবে, আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে কখনই অত্যাবশ্যক শিল্প-কারখানা (যেমন, ক্যাপিটাল, ডুরেবোল ও অন্তর্বর্তী পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প-কারখানা) স্থাপন করার সুযোগ দেবে না। কারণ, তাতে বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব শিল্প-কারখানার প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হবে। এসব শিল্প-কারখানা শিল্পোন্নত দেশের জাতীয় নিরাপত্তার অপরিহার্য অংশবিশেষ। শিল্পোন্নত দেশ কখনো সজ্ঞানে তাদের অত্যাবশ্যকীয় শিল্প-কারখানার প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরী হতে দেবে না। তাদের জনগণের জীবিকা ও জীবনযাত্রার মান এই শিল্পের উপর সরাসরি নির্ভরশীল।

সুতরাং একথা আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, গ্রামীণ ব্যাংকসহ শিল্পোন্নত দেশের সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল এনজিওগুলি বাংলাদেশে কখনই অত্যাবশ্যকীয় শিল্প-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারবে না। এখানে একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। উনিশ শো নব্বুই দশকের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে স্থাপিত বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ (বিডিআই : ওয়েব সাইট - www.bdiusa.org) প্রতিষ্ঠানটি ডক্টর ইউনুসকে বাংলাদেশী

প্রাইভেট সেক্টরের মুমূর্ষু যন্ত্র-নির্মাণ কারখানাগুলির সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলো। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই যে, উত্তরে ডক্টর ইউনুস একথাই জানিয়েছিলেন: যন্ত্র-নির্মাণ শিল্প-সংক্রান্ত কাজ গ্রামীণ ব্যাংকের এক্তিয়ার-বহির্ভূত।

এই আলোচনাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে -

(ক) গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য এনজিওগুলি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শিল্পোন্নত দেশে উৎপন্ন উচ্চ-মূল্য পণ্য, যেমন, ক্যাপিটাল, ডুরেবোল ও অন্তর্বর্তী পণ্যদ্রব্যের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে;

(খ) এনজিও সম্প্রদায় তাদের কার্যক্রমের অধীনে এসব পণ্যদ্রব্য শিল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানী করে;

(গ) এই পণ্যদ্রব্য স্বদেশে উৎপাদন করার জন্য যে-ধরণের কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন তারা সেগুলি থেকে দূরে সরে থাকে; এবং

(ঘ) তারা যে-প্রকৃতির কার্যক্রম গহণ করে তা স্বদেশে এসব পণ্য উৎপাদনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ কেউ হয়তো বলার চেষ্টা করতে পারে, গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য এনজিও উচ্চ-মূল্য উচ্চ-প্রযুক্তি উচ্চ-উৎপাদনশীলতার পণ্যদ্রব্যের সাথে জড়িত আছে। যেমন, গ্রামীণ ব্যাংক মোবাইল ফোন নিয়ে কাজ করছে, অথবা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এন্টিবাইওটিক ওষুধ প্রস্তুত করছে, প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, বাথরুম সরঞ্জাম, ইত্যাদি নির্মাণ করছে। খুব বেশী চিন্তা ছাড়াই বোঝা যাবে, আসলে এই এনজিওগুলি এসবক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাথমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক জ্ঞানসীমার অন্তর্ভূক্ত কাজগুলিই শুধু সম্পাদন করছে।

যেমন, গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে মক্কেলরা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত মোবাইল ফোন কেবল ব্যবহার করছে, নির্মাণ করছে না। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কর্মীরা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত উচ্চ-প্রযুক্তি উচ্চ-মূল্যের ওষুধের গুড়ো ও রসায়নিক তন্তু (অন্তর্বর্তী পণ্য) সংযোজন (অ্যাসেম্বল) করছে মাত্র, স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করছে না। এর ফলে এনজিও কর্মীদের উৎপাদনশীলতা সেই প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে থেকে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের গড় উৎপাদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ মাথাপিছু আয় গড়ে দৈনিক মাত্র ১ মার্কিন ডলারের সমান।

বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা বাঞ্ছিত মাত্রায় বাড়াতে হলে এই উচ্চ-প্রযুক্তি উচ্চ-মূল্যের পণ্যদ্রব্য, যেমন, মোবাইল ফোন (ডুরেবোল গুড্স্), ওষুধের গুড়ো ও রসায়নিক তন্তু স্বদেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, 'হার্ডওয়ার' ও 'সফট্ওয়ার'সহ মোবাইল ফোন গোড়া থেকে নির্মাণ, অথবা ওষুধের গুড়ো ও রসায়নিক তন্তু গোড়া থেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলি লক্ষ লক্ষ স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ-ডি ডিগ্রীধারী দক্ষ কর্মী নিয়োগ করছে।

ফলে, সেসব দেশে উৎপাদনশীলতাও আনুপাতিক হারে অনেক উঁচু এবং তাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় ১০০ থেকে ১৫০ মার্কিন ডলারের সমান। এভাবেই এনজিওগুলি তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে দাতা-সমর্থক শিল্পোন্নত দেশ থেকে উচ্চ-প্রযুক্তি উচ্চ-মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানীর কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি করছে এবং বাংলাদেশে মাথাপিছু দৈনিক আয় ১ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি রাখার বিনিময়ে শিল্পোন্নত দেশে ১০০ থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার মাথাপিছু দৈনিক আয় বজায় রাখার মদদ যোগাচ্ছে।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ ডক্টর ইউনুসের করণীয় কাজ কি হবে। আমরা নীচে এ-ধরণের একটি বাস্তবায়নযোগ্য ও পূর্ব-পরীক্ষিত পরিকল্পনার নক্সা আঁকার চেষ্টা করেছি।

(৩) জাতীয় উন্নয়নে ডক্টর ইউনুস মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন

''বাংলাদেশের সত্যিকার উন্নয়ন'' কিভাবে শুরু করা যাবে এ নিয়ে আমরা অনেক বই-বিশ্লেষণ লিখেছি, কিন্তু তা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য কোন কার্যক্রম বা পরিকল্পনা এ-পর্যন্ত তৈরী হয়নি। এদিকে একজন গড়পরতা বাংলাদেশী দুঃক্ষজনকভাবে দিনপ্রতি ১ মার্কিন ডলার সমতুল্য সম্পদ উৎপাদন ক'রে অত্যন্ত নিম্নমানের অব-মানবিক জীবন যাপন করে চলেছে। কথাটি যাতে দৃষ্টির আড়ালে চলে না যায় তাই এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, এই গড়পরতা বাংলাদেশী গণনার মধ্যে ক্ষমতাশীন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং নিকট রাজনৈতিক অনুসারী, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং নিকট রাজনৈতিক অনুসারী, সামরিক ও বেসামরিক আমলা ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং নিকট রাজনৈতিক অনুসারী এবং সহযোগী ব্যবসায়ী/আমদানীকারক ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সত্যি কথাটা থেকে যায় : আমরা যদি এই গড় বাংলাদেশীকে শিল্পোন্নত দেশের একজন গড় নাগরিকের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেই, যে-নাগরিক দিনপ্রতি ১০০ থেকে ১৫০ মার্কিন ডলার হারে সম্পদ উৎপাদন করছে, তাহলে উন্নত দেশের নাগরিকের সামনে বাংলাদেশীকে সর্বার্থে অনেক ছোট দেখাবে। এই তুলনাটিকে কঠোর বা কর্কস মনে হলেও এটাই আমাদের বাস্তবতা।

অতীতে আমরা যথার্থ ও ন্যায্য শুল্ক-কাঠামো ও অনুকূল উৎপাদন পরিবেশ নিশ্চিত করাকে অতিবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে রায় দিয়েছি। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে টাল-বাহানা করার ফুরসৎ আমাদের আর নেই। কারণ এই বিষয়ের মধ্যে ১৩০ মিলিয়ন মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। তাই আমরা মনে করি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ডক্টর ইউনুসকে রাস্ট্র-দায়িত্ব, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিৎ। এছাড়া দ্রুত গতিতে দেশোন্নয়নের খাতিরে আমরা জরুরীভিত্তিতে এবং অনতিবিলম্বে ডক্টর ইউনুসকে মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সুপারিশ করছি। এই পদাঙ্কের ধাপগুলি এ রকম :

(১) টয়োটা করোলা বা ফোর্ড এস্কোর্ট জাতীয় একটি গাড়ী বেছে নিন এবং গাড়ীটির নাম দিন ''দোয়েল-১'' (মাহাথির মোহাম্মদের গাড়ীর নাম ছিল ''প্রোটোন সাগা''),

(২) বাংলাদেশে আমদানীকৃত বিদেশী গাড়ীর উপর ৩০০% শুল্ক বসিয়ে দিন,

(৩) আগামী দশ-বারো বছরের মধ্যে গাড়ীটি সফলতার সাথে ডিজাইন ও নির্মাণ করুন, এবং

(৪) আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি করুন।

শিল্পোন্নত দেশে প্রতিটি নাগরিক গড়ে একাধিক গাড়ীর মালিক। আমরা যদি ধরে নেই প্রতিটি বাংলাদেশী গড়ে মাত্র একটি গাড়ীর মালিক হবেন, তাহলে দেশের অভ্যন্তরে এককালীন চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৩০ মিলিয়ন গাড়ী। ধরা যাক টয়োটা করোলা বা তার সমতুল্য গাড়ীর সাধারণ দাম ১৫,০০০ মার্কিন ডলার। এতে ৩০০% আমদানী শুল্ক বসিয়ে দিলে

এই গাড়ীর দাম বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৬০,০০০ মার্কিন ডলারে। অতিরিক্ত চড়া দামের ফলে এই ধরণের আমদানীকৃত বিদেশী গাড়ী অধিকাংশ বাংলাদেশীর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। ধরে নেওয়া যাক ৩০ মিলিয়ন বাংলাদেশী স্থানীয়ভাবে নির্মিত গাড়ী না কিনে ৬০,০০০ মার্কিন ডলার দিয়েও আমদানীকৃত বিদেশী গাড়ী কিনতে ইচ্ছুক হবেন, যদিও স্থানীয় গাড়ী সম্ভবতঃ ৮,০০০ মার্কিন ডলারে বিক্রি করা যাবে। এরপরও আমাদের হাতে ১০০ মিলিয়ন গাড়ীর অনুমিত চাহিদা থেকে যাবে।

আমরা যদি এই রকম বিশাল এককালীন চাহিদা আনুমানিক দশ বছরের মধ্যে মেটাতে চাই তাহলে গাড়ী উৎপাদনের হার হতে হবে বছরে ১০ মিলিয়ন, অর্থাৎ দিনে প্রায় ২৮,০০০টি গাড়ী। এটি দশ বছর সময়ব্যাপী ৮০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ৭০ টাকা = ১ মার্কিন ডলার বিনিময় হারে ৫৬ ট্রিলিয়ন টাকার ব্যবসার একটি প্রস্তাবনা। এরপর সারা অর্থনীতির উপর 'লিঙ্কেজ এফেক্ট' তো রয়েছেই, বিশেষতঃ কৃষিক্ষেত্রের উপর। স্বয়ংক্রিয়তা আসার ফলে কৃষিক্ষেত্রেও আনুপাতিক হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কৃষি-প্রধান বাংলাদেশের জন্য দোয়েল-১ প্রকল্পের মতো স্থিরলক্ষ্য ও সুপরিচালিত উদ্যোগ খুবই যথোপযুক্ত। কারণ কৃষিতে উচ্চ মাত্রার উৎপাদনশীলতা কেবল শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি দিয়েই শুরু ও রক্ষা করা সম্ভব। দোয়েল-১ প্রকল্প এবং এর থেকে সৃষ্ট কারিগরী জ্ঞান ও ক্ষমতা দেশে সাচ্চা কৃষি-বিপ্লব ঘটাবে বলে আশা করা যায়। এর সাথে শুরু হবে তথাকথিত ''লুইসিয়ান টার্ন'', অর্থাৎ কৃষিকর্মীদের শিল্পক্ষেত্রের দিকে অত্যাবশ্যকীয় মঙ্গলযাত্রা। সব শিল্পোন্নত দেশেই এটা ঘটেছে।

আমরা উপরে মোটামুটি একটি হিসাব করে দেখিয়েছি যে, দশ বছরে জনপ্রতি একটি গাড়ীর এককালীন চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের দৈনিক প্রায় ২৮,০০০টি গাড়ী উৎপাদনের প্রয়োজন পড়বে। আমরা যদি ধরে নেই একটি কারখানা প্রতি ঘন্টায় একটি গাড়ী উৎপাদন করতে সক্ষম এবং কারখানাটি কয়েকটি শিফ্‌টে ২৪ ঘন্টা চালু থাকে, তাহলে সারা বাংলাদেশব্যাপী এই ধরণের প্রায় ১,২০০টি কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন পড়বে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা অঞ্চলে ১৮টি অনুরূপ কারখানা স্থাপন করতে হবে। দোয়েল-১ উদ্যোগটি যে কত বিশাল আকৃতির হবে তা এই হিসাব থেকে আনুমান করা যাবে।

ডক্টর ইউনুস যদি এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সফল হন তাহলে আজ মালয়েশিয়া যেখানে অবস্থান করছে আমাদের দেশ নিশ্চিতভাবে সেদিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সূচক, যেমন, শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, দরিদ্রতা, নারী-সমস্যা, দূর্নীতি, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিশুমৃত্যু, ইত্যাদিতে আনুপাতিক হারে উন্নতি ঘটবে। বলে রাখা ভালো, আর্থ-সামাজিক সূচক তথা জনকল্যাণ নিশ্চিত করার এটাই প্রকৃত পন্থা, 'দারিদ্র্য বিমোচন'মূলক কার্যক্রম নয়।

তাই দোয়েল-১ উদ্যোগকে একটি একক গাড়ী নির্মাণ প্রকল্প বলে প্রতীয়মান হলেও এটি আদতে গোটা জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান, অর্থাৎ এটি নির্ভুলভাবে একটি জাতীয় সমাধান। এছাড়া এতে পরিবেশ বিনাশ হবে না। উল্টোদিকে, আবু আবদুল্লাহ সাহেবের ভাষায়, এই উদ্যোগ ও তদ্দরুণ সৃষ্ট অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভূত কারিগরী দক্ষতা পরিবেশ দূষণ সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।

এরূপ বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যমতের প্রয়োজন পড়বে। এর গূঢ়ার্থ হচ্ছে, এই উদ্যোগকে বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এটা হবে সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের জন্য দেশপ্রেমের একটি অগ্নি-পরীক্ষা। নেতৃবৃন্দকে বর্তমান রাজনৈতিক বিরোধের উপরে উঠতে হবে। আমরা জানি, বর্তমান রাজনৈতিক বিরোধ হচ্ছে কমিশন, লাইসেন্সিং এবং অন্যান্য রেন্ট-সিকিং কার্যকলাপ

থেকে সৃষ্ট কয়েক শো হাজার কোটি টাকার বাৎসরিক আয়ের সুযোগ হস্তগত করার বিরোধ। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কেবল এই 'পরজীবী' আয় হস্তগত করার অধিকার ও পথ নিশ্চিতকরণের মহড়া মাত্র। জাতীয় উন্নয়নে এই আয়ের কোন ভূমিকা নেতিবাচক। এক্ষেত্রে ডক্টর ইউনুসের বর্তমান অবস্থান জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টিতে সহায়তা করবে এবং দোয়েল-১ উদ্যোগটি গহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেবে বলে আশা করা যায়।

ডক্টর ইউনুস একজন ''অটোমোবাইল জার'' বা সংক্ষেপে ''অটো জার'' নিয়োগ করতে পারেন। এছাড়া তিনি একটি ''অটোমোবাইল সেল'' বা সংক্ষেপে ''অটো সেল''ও গঠন করতে পারেন যেটি অটো জারের নির্দেশাধীনে থাকবে। অটো সেলটিকে অবশ্যই সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামরিক বাহিনীসহ দেশের সব শাখার আইন প্রতিরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান সেলটিকে সমর্থন যোগাবে ও প্রতিরক্ষা করবে। অটো সেলটিকে পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে ''দোয়েল-১ প্রকল্প'' কামিয়াব করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও জনশক্তি ব্যবহারের অগ্রাধিকার যেন সেলটির থাকে। অটো সেল মালয়েশিয়া ও জাপানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্রজ ''গুরুদেশ'' হিসাবে গণ্য করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে এই দুটি দেশ থেকে কারিগরী সহায়তা চাইতে পারে।

মাহাথির মোহাম্মদ তথাকথিত ''পূব দিকে তাকাও'' নীতি গ্রহণ করেছিলেন যার অর্থ ছিলো মূলতঃ জাপানের কাছ থেকে পথনির্দেশনা ও সহযোগিতা চাওয়া। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ অটো সেল ''মালয়েশিয়ার দিকে তাকাও'' নীতি গ্রহণ করতে পারে এবং দোয়েল-১ গাড়ীকে কামিয়াব করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ভারী যন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় করার কাজে ব্যবহৃত ক্যাপিটাল গুড্স্ মালয়েশিয়া ও জাপান থেকে কেনার পরিকল্পনা করতে পারে।

মালয়েশিয়া, জাপান ও অন্যান্য সফল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সাথে জোট বাঁধলে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও উত্তর আমেরিকার বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। এই বিরোধিতা মোকাবেলা করা সম্ভব কেবল যদি সব শীর্ষস্থানীয় দলের নেতাদের দোয়েল-১ প্রকল্পে পূর্ণাঙ্গ ও অকুণ্ঠ অনুমোদন থাকে। এখানেও ডক্টর ইউনুসের বর্তমান অবস্থান কাজে আসবে বলে আশা করা যায়।

এবার সঠিক ব্যক্তিকে ''অটো জার'' হিসাবে নিয়োগ করার প্রশ্নে আসা যাক। এই পদে ডক্টর ইউনুস এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিবেন যে এ-ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে আগ্রহী, যার দক্ষতা আছে এবং যে এই কাজটি করিয়ে নেবার প্রাসঙ্গিক জ্ঞান রাখে। সঠিক মেধা, গভীরতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাওয়া না গেলে তিনি একজন পরিপক্ক ও প্রণোদিত প্রবাসী বাংলাদেশীকে ইউরোপ অথবা উত্তর আমেরিকা থেকে নিয়োগ দিতে পারেন।

নিযুক্ত প্রবাসী বাংলাদেশী ও তার পরিবার এখানে যেন কমপক্ষে ইউরোপ/উত্তর আমেরিকাতে বসবাসের সমতুল্য উঁচুমানের জীবনযাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। ডক্টর ইউনুস অটো জারের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ ডাক্তারী চিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের স্কুল, দৈহিক নিরাপত্তা, ইত্যাদি নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি অটো জারের পরিচিতি চিরতরে জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দিতে পারেন, অর্থাৎ জনগণ জানবেই না অটো জার ব্যক্তিটি কে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা কোন সস্তা আবেগের ব্যাপার নয় - এর জন্য কারো জীবন উৎসর্গ করে দেবার প্রয়োজন নেই। একমাত্র লক্ষ্য হলো দোয়েল-১ গাড়ীকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

আমরা বুঝতে পারছি, ডক্টর ইউনুস দোয়েল-১ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে মালয়েশিয়া আজ উন্নতির যে পর্যায়ে সেই অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

(৪) শেষ করার আগে

অনেকে বলছেন, ডক্টর ইউনুসের নোবেল পুরস্কার পাবার পাদপিঠে বাংলাদেশে যে উত্তেজনা ও তোলপাড় শুরু হয়েছে তার তীব্রতাকে কেবল ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে তুলনা করা যায়। পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশের জন্য এটি একটি মহাসুযোগ। এ-সুযোগ হাতছাড়া করা উচিৎ হবে না। আমরা উপরে গ্রামীণ ব্যাংক তথা এনজিও কর্মকাণ্ড ও নীতিমালার সমালোচনা করেছি। পাঠকরা বুঝবেন, এই সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই, ডক্টর ইউনুসের রাস্ট্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বভার গহণ করা উচিৎ। ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক তথা এনজিওর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল আছেন। দেশগড়ার কাজে তিনি নিজেই এই নীতিমালা থেকে দূরে থাকবেন।

তবে গ্রামীণ ব্যাংক সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ডক্টর ইউনুস বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ‘‘আমরাও পারি’’ - আমরাও সফলভবে সংগঠন তৈরী ও পরিচালনা করতে পারি। ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন ও প্রায় শতকরা একভাগ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন। দোয়েল-১ উদ্যোগটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি আরেকবার বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করে দেবেন, আমরাও পারি - আমরাও গাড়ী বানাতে পারি - আমরাও দেশ গড়তে পারি।

একবার কাজ শুরু করে দিলে ডক্টর ইউনুস বুঝবেন, একাজে তার সহমর্মী ও সহকর্মীর অভাব হবে না। রেন্ট-সিকিং/কমিশনভোগী তিনটি শ্রেণী স্বদেশে উৎপাদনবিরোধী শুল্ক-ব্যবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করে অনেক নিবেদিত-প্রাণ স্বদেশী উৎপাদক, বিশেষতঃ যন্ত্র-নির্মাতা সম্প্রদায়কে পাদপিষ্ট করে রেখেছে। আমরা আশা করি, দোয়েল-১ প্রকল্পের মাধ্যমে ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের মতই বাংলাদেশের উৎপাদনমনা উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করতে সক্ষম হবেন এবং দোয়েল-১ গাড়ী বানিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেবেন, ‘‘আমরাও পারি’’।

ডক্টর ইউনুসসহ পৃথিবীর উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা অবগত আছেন যে, মূলতঃ ‘‘প্রোটোন সাগা’’ গাড়ীকে কেন্দ্র করে মাহাথির মোহাম্মদ কিভাবে মালয়েশিয়ার রূপ বদ্‌লিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, ডক্টর ইউনুসও দোয়েল-১ গাড়ী বানানোর মাধ্যমে দুই/এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টিয়ে দিতে সমর্থ হবেন।